আমার দূরদর্শী বাবা আর আমি যখন স্কুলের দপ্তরি

১৯৭২ সাল জানুয়ারী মাস । বাংলাদেশ সবে মাত্র স্বাধীন হয়েছে। “আমাদের পরিবারের বিপদ কেটে গিয়েছে। রাজাকার চেয়ারম্যানের ক্ষমতা এখন শেষ। এবার কিছু একটা করতে হবে “---কথা গুলো আমার বাবার। আমরা যে গ্রামের বাসিন্দা তাদের মধ্যে শুধু একটি মাত্র পরিবার শিক্ষিত ছিল; তা আমাদের পরিবার। বাবার মুখে সব সময় শুনতাম গ্রামের মানুষদের শিক্ষিত করতে হবে । যে ভাবে হোক একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে । একজন শিক্ষিত লোক পাওয়া গেল। তিনি আমার চাচাত বোন জামাই মৌলভী জহিরুল ইসলাম। মসজিদে ইমামতি ও সকালে মক্তবে আরবী পড়াতেন। সকালে মক্তবে কিছু ছেলে মেয়ে আসতো। বাবা ঠিক করলেন তাদের আরবীর পাশাপাশি বাংলা পড়ানো যেতে পারে। সময় বেশী দিলেই চলবে। ঠিক হয়ে গেল একটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। বিদ্যালয় ঘর; আপাতত মক্তব । আমাদের কাচারী ঘরে ( বৈঠক ঘর) পঠন পাঠন শুরু।

গ্রামের মানুষ সবাই অশিক্ষিত । তেমন সাড়া মিলল না । তাদের কোন মেয়েকে বাংলা পড়াতে রাজী হলোনা । গরীব মানুষগুলোর ছেলেদের রাখালের কাজ করতে হতো । সুতরাং স্কুলের ছাত্র আমি আর পাশের গ্রামের ডাক্তার ইসমাইলের দু ছেলে। তাদের একজন আবার প্রতিবন্ধী। চাচাত ভাই সাইফুল কে কোনমতে স্কুলে আসতে রাজি করালাম । এক শুক্রবার শুরু হয়ে পরের শুক্রবার মানে এক সপ্তাহ । তখনকার দিনে শুক্রবারে স্কুল খোলা থাকতো। বাবার মাথায় নতুন বুদ্ধি , ছাত্র ছাত্রী বাড়াতে হলে প্রচারের জন্য স্কুলে ঘন্টা বাজাতে হবে । নিজ প্রতিষ্ঠানের কাসার ঘন্টা খানা কয়েকদিন ধার করে আনলেন । আমরা সময় অসময় মনের আনন্দে এই ঘন্টা বাজাতাম। ধার করে ঘন্টা বাজানো ; তা হবে না, এটা অন্যায়। একটি পিতলের ঘন্টা চাই। চট্টগ্রাম শহর ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না।

মাস তিনেক আগে কক্সবাজার বিমান বন্দরে ( নুনিয়া ছড়ায়) বোমা ফেলা হয়। বিমান বন্দর বড় বড় গর্তে পরিনত হয়। কয়েকদিন পর এখানে আমাদের সেজ চাচা (খুইল্যাবাজী) একটি বোমার খোলস পান। ওজন প্রায় ২০ কেজি হবে। তিনি এটা বাবাকে দেখালেন। বোমার খোলসটি বাবা বাড়ী নিয়ে আসলেন। হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে দেখলেন। দারুন আওয়াজ। ঠিক করা হলো বোমার খোলসটিকে স্কুলের ঘন্টা হিসেবে ব্যবহার করা হবে। আমি পড়াশুনার পাশাপাশি মনের আনন্দে দপ্তরি বনে গেলাম । মনের আনন্দে সকাল ১০টায় লম্বা বেল বাজাতাম। পর পর তিন বার , কিন্তু কোন ছাত্র ছাত্রীর দেখা নাই। শুধু আমরা ৪ জন।

কয়েক মাসের মাথায় আমরা ১- ৪ পর্যন্ত কোরাস সুরে গুণের নামতা মুখস্ত বলতে শিখলাম। মকবুল হোসেন(আইএ) স্যার ,মাইল দুয়েক দূরের গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি রাজি হলেন স্কুলে পড়াবেন। দু জনে যথারীতি পঠনপাঠন চালাতে লাগলেন। হঠাৎ ঝগড়া করে চাচাত ভাই ( মারা গিয়েছে) স্কুল আসা বন্ধ করে খালে মাছ ধরতে চলে যায়। ছাত্র বাকী রইলাম ৩ জন । বাবা জুমার খুতবায় বহুবার আহ্বান করলেন কিন্তু পড়া শুনার গুরুত্ব মুসল্লিদের মাঝে পয়দা করতে ব্যর্থ হলেন।

মকবুল স্যার পেশায় কোয়াক ডাক্তার হওয়ায় এখানে তার ক্ষতি হতে লাগলো। হঠাৎ একদিন প্রস্তাব করলেন স্কুল টি তার বাড়ীর পাশে হলে ভাল হয়। ডাক্তারী মাস্টারী দুটো চালাতে পারবেন। বাবাও রাজি হলেন। স্থানান্তরিত হলো স্কুল । আমি আর যেতে পারলামনা; দপ্তরি কাজে ইস্তফা দিতে হল। পাশের গ্রামের পাহাশিয়াখালী প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হলাম। পরদিন সকাল ১০টায় ঘন্টার আওয়াজ শুনা গেলনা। ১১টায় ১ ঘন্টার বাড়ি পড়ল না। বাবা জায়নামাজে বসে বিড় বিড় করে কি যেন বলছেন আর চোখের পানি সাদা পাঞ্জাবীতে গড়িয়ে পড়ছে। তিনি আজানু লম্বা কোর্তা (পাঞ্জাবী) গায়ে দিতেন । আমি বুঝতে পারলাম গ্রামের শিক্ষা বিস্তারের প্রতি তার কত দরদ।

১৯৮২ সাল , বাবা অবসর নিলেন। গ্রামবাসীর সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করলেন ইছাখালী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা। ৩০-৫০ জন ছাত্র ছাত্রী হলো । শিক্ষক হলাম আমি সহ ৫ জন । মাদ্রাসা সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করলো । বোর্ড শর্ত দিল টাইটেল পাস সুপারিন্টেডেন্ট নিয়োগ দিতে হবে । সুপারিন্টেডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিলেন জনৈক বিকাশ চন্দ্র পাল বাবু কে। অনেক খুজে এখানে তাকে পাওয়া গেল। তিনি টাইটেল পাস ছিলেন । বাংলা শিক্ষক বাবু সরোজ কুমার আচার্য। গ্রামে কানাঘুষা পড়ে গেল। হিন্দু আবার মাদ্রাসায়? এ কেমন তামাশা; ধর্ম নিয়ে তামাশা। বাবা মাদ্রাসা কমিটিতে উদার মনের বেশ কয়েক জনকে যুক্ত করলেন। এ সময় তাদের মধ্যে গ্রামের শিক্ষোন্নতির চিন্তা জাগাতে সমর্থ হলেন। একদিন বক্তৃতায় বলে ফেললেন শুধু মুসলিম কেন সকল জাতীর শিক্ষার অধিকার রয়েছে। আবার ১৯৭১ সালের স্কুলের কথা স্মরণে আনলেন।

কাকতালীয়ভাবে সে বছর প্রাগোক্ত স্কুলখানা নদীর ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে গেল। কর্মরত শিক্ষকরা বাবার স্মরনাপন্ন হলেন। কি তাজ্জব ব্যাপার ;১৯৭২ সালে যে সব লোক স্কুল প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা করছিলেন তাদের একজন জমি দিতে রাজি হলেন। আর একজন সেমি পাকা ঘর করে দিতে। বাবা তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এক মাসের মধ্যে স্কুল ঘর হয়ে গেল। স্থানীয় অন্য ধর্মালম্বীর সন্তানেরা স্কুলে আর মুসলিম সন্তানেরা মাদ্রাসায় ভর্তি হতে লাগলো। পাড়ায় কোন শিশু কিশোর আর মার্বেল ,লাটিম ,ডাঙ্গুলি, গরুর লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকলো না। আজ আর রাখাল নেই। কেও স্কুলে আর কেও মাদ্রাসায় পড়ে। প্রায় শতকরা ৮০ ভাগের উপর শিক্ষিত। ২০১৫ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশের অভিভাবক ,জাতীর জনক এর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা স্কুলটিকে সরকারী করেছেন। এখন আর পেছনে তাকানোর দরকার নেই।

আজ বাবা নেই । মৌলভী জহির নেই। প্রথম সহপাঠী সাইফুল নেই। আমার দপ্তরীর পেশাও নেই। যখন দেখি আমার প্রিয় দপ্তরীরা ঠুং ঠুং করে ঘন্টা বাজায়,মনের মাঝে এক অনাবিল আনন্দস্রোত বয়ে যায়। ফিরে যাই কৈশোরে, মনে পড়ে আমার প্রয়াত আব্বাজানের কথা, বোমার ঘন্টা পেটানোর কথা। যে পাকিস্তানী হানাদার বোমা মেরে ধংস করতে চেয়েছিল, বাবা সেই বোমার বিকট আওয়াজকে স্কুলের ঘন্টা ধ্বনি বানিয়ে দিলেন। ধ্বংসের ভয়ে , বোমার আওয়াজে যারা পালিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন , তাদের সন্তানরা ঘন্টার আওয়াজে এগিয়ে আসছে। ধ্বংস থেকে আজ হাজার হাজার শিক্ষিত মানুষ তৈরী হচ্ছে। আমার ঘন্টা আজ প্রতিষ্ঠিত । আমি একজন সফল দপ্তরি।